বিএনপি সরকারের
১৮০ দিন

পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি থেকে পুরোনো রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন
অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, পরিকল্পনাহীনতা

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ – আগস্ট ২০২৬

পলিসি ও রিসার্চ বিষয়ক উপকমিটি, এনসিপি

বিএনপি সরকারের ১৮০ দিন

পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি থেকে পুরোনো রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন

অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, পরিকল্পনাহীনতা

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ – আগস্ট ২০২৬

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ১৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকে সরকার ১৮০ দিনের জন্য তিনটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছিল: দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ-জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা। ছয় মাস পর তথ্য-উপাত্ত ও মাঠপর্যায়ের বাস্তবতায় দেখা গেছে, এই তিনটি অগ্রাধিকারের প্রতিটিতেই সরকার নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জ্বালানী সংকটে কল-কারখানাগুলো বন্ধ হচ্ছে এবং শ্রমিকেরা চাকুরি হারাচ্ছে। কৃষককে উচ্চমূল্যে সার কিনতে হচ্ছে।

জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের নজিরবিহীন সংকট শিল্প উৎপাদন, কৃষিখাত ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করেছে; নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে; ব্যাংকিংখাতের লুটেরারা পুনরায় ফেরত আসছে; ভোগ্যপণ্য ও আমদানি বাজারে পুরোনো সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়েছে এবং বিএনপি তাতে নতুন অংশীদার হিসাবে যুক্ত হচ্ছে। ৫ মাস দুদকের নিষ্ক্রিয়তা ও লুটেরা এবং বাজার সিন্ডিকেটের প্রত্যাবর্তন একইসূত্রে গাঁথা বলে আমরা মনে করি।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রেখে যাওয়া সংস্কারগুলো, যেমনঃ মানবাধিকার কমিশন, গুম প্রতিরোধ আইন, সুপ্রিমকোর্ট সচিবালয়, একে একে বাতিল করা হয়েছে। এসবের জায়গায় আগের চেয়ে দুর্বল ও অকার্যকর আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। বহুল প্রচারিত ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারকে ছুঁড়ে ফেলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্লজ্জ দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে।

জুলাই গণহত্যার বিচার নিয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। সরকার নির্ধারিত অগ্রাধিকার পলিসিতে বিচার ও শহীদ পরিবার-আহতদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন অনুপস্থিত।

বিরোধী দল-মত ও সাংবাদিকদের ওপর সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের হামলা-মামলার ঘটনা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। এমনকি প্রশাসনের কর্মকর্তারাও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই হামলাকারীদের পরিবর্তে হামলায় আহতদের আইনিভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। পুলিশকে ফের দলীয় বাহিনীতে পরিণত করা হচ্ছে। সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ না নেওয়ার মধ্য দিয়ে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও জুলাই সনদ ভঙ্গ করেছে। বিএনপি সরকারের ১৮০ দিন মূলতঃ অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, অপরিণামদর্শিতা এবং অসততার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

এক. অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, জ্বালানি সংকট ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি

১.১ জ্বালানি তেল সংকট

দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মাথায়, মার্চ ও এপ্রিল মাসে দেশের পাম্পগুলোতে ভয়াবহ পেট্রোল ও ডিজেল সংকট দেখা দেয়। পাম্পগুলোর সামনে কয়েক মাইলজুড়ে তৈরি হয় গণপরিবহণ, প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের দীর্ঘ সারি; এক লিটার তেলের জন্য অনেককে টানা ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। এসময় রাইড-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী তরুণদের আয়ের পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

এই সংকটের মধ্যেই সরকার জ্বালানি তেলের দাম রেকর্ড পরিমাণে বাড়ায়; প্রতি লিটারে ডিজেলে ১৫ টাকা, অকটেনে ২০ টাকা, পেট্রোলে ১৯ টাকা এবং কেরোসিনে ১৮ টাকা। এর প্রভাবে গণপরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ে এবং কৃষি উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে জ্বালানি সংকটে দুই মাসে তৈরি পোশাক, ইস্পাত, সিমেন্ট, ওষুধ, হিমায়িত মৎস্য ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদন কারখানায় গড়ে ২৪ শতাংশ উৎপাদন হ্রাস পায়। এরপরও জ্বালানি মন্ত্রী জনাব ইকবাল হোসেন মাহমুদ টুকু সংসদে দাঁড়িয়ে দাবি করেন, দেশে জ্বালানি তেলের কোনো সংকট নেই।

এই সংকটের পেছনে সরকারি দলের স্থানীয় নেতাদের প্রশ্রয়ে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের ভূমিকা দেখা গেছে। পাম্পের ভূগর্ভস্থ ট্যাংকে তেল মজুদ রাখার ঘটনা স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও প্রশাসনিক অভিযানে উঠে এসেছে। সরকার এই সিন্ডিকেট ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু, বাস্তব অভিজ্ঞতা বা সক্ষমতা ছাড়াই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কিছু গোষ্ঠী উচ্চ কমিশনের ভিত্তিতে তেল-গ্যাস সরবরাহ ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছে এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (BPC) ও পেট্রোবাংলার মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে পাইকারি বিক্রির সুযোগ পাচ্ছে। জ্বালানি ক্রয়ে স্বচ্ছতার প্রশ্ন এখানে অনুপস্থিত।

১.২ গ্যাস সংকট, ব্যাহত উৎপাদন এবং শ্রমিকের চাকুরি ঝুঁকি

গত দেড় মাস ধরে যুক্ত হয়েছে গ্যাস সংকট। ঢাকার মতো শহরে দিনে ১২-১৪ ঘণ্টা চুলা জ্বলছে না, আর লোডশেডিংয়ের কারণে বিকল্প হিসেবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগও সীমিত। বাংলাদেশের ইতিহাসে শিল্পকারখানায় এত দীর্ঘ সময় ধরে গ্যাস সরবরাহে এমন সংকট বিরল। গৃহস্থালিতে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে রান্না করতে হচ্ছে।

নির্দিষ্ট কিছু কারাখানায় উৎপাদন ২৪ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। কাচ, ইস্পাত, বস্ত্র, তৈরি পোশাক, সিরামিক ও বেকারি শিল্পে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। আশুলিয়া, সাভার, গাজীপুর, কালিয়াকৈর, ময়মনসিংহ, ভালুকা, ত্রিশাল, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও হবিগঞ্জে গ্যাসের চাপ কোথাও শূন্যে নেমে গেছে, যেখানে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন অন্তত ৩-৪ পিএসআই। এর ফলে নির্ধারিত সময়ে পণ্য জাহাজীকরণ ব্যাহত হচ্ছে, ক্রেতারা ২০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় দাবি করছেন এবং কেউ কেউ ক্রয়াদেশের একাংশ অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন। বিজিএমইএ সদস্য কারখানাগুলো বর্তমানে সক্ষমতার তুলনায় গড়ে ৩০-৩৫ শতাংশ কম উৎপাদন করছে।

পত্র-পত্রিকার বরাতে, দেশের শিল্পাঞ্চলের অন্যতম হাব হবিগঞ্জে একসাথে ১৭১টি শিল্পকারখানার উৎপাদন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। নারায়ণগঞ্জে প্রায় ৪৫০টি ডাইয়িং কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর এবং চট্টগ্রামের চিত্রও একই। উৎপাদন কমে যাওয়ায় শ্রমিক ছাঁটাইও হচ্ছে। এভাবে শ্রমিকদের চাকুরি ঝুঁকিও তৈরি হচ্ছে।

দেশে দৈনিক গ্যাস সরবরাহ সার্বিকভাবে নেমেছে ২১৫ কোটি ঘনফুটে, যেখানে চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। এই বিপুল ঘাটতি সত্ত্বেও সরকার এখন পর্যন্ত সুপরিকল্পিত কোনো সমাধান বা পরিকল্পনা হাজির করতে পারেনি; বরং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়াকে ‘হঠকারিতা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সরকারের ব্যর্থতা কেবল সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় নয়; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংকট ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হচ্ছে। সংকটকে পুঁজি করে স্পট মার্কেট থেকে বেশি দামে জ্বালানী ক্রয় তথা লুটপাটের আয়োজন করা হচ্ছে।

১.৩ বিদ্যুৎ সংকট ও রেকর্ড লোডশেডিং

বিএনপি ক্ষমতা গ্রহণের পর চলতি মাসেই বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ লোডশেডিং রেকর্ড হয়েছে; গ্রাম ও মফস্বলে দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল। বিতরণ কোম্পানিগুলোর সিস্টেম লসের দায় গ্রাহকদের ওপর চাপানো হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ-জ্বালানি ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি এবং দুই বছর মূল্যবৃদ্ধি না করার অঙ্গীকার সত্ত্বেও মাত্র তিন মাসের মধ্যে পাইকারি পর্যায়ে ১৯.৮৫ শতাংশ ও গ্রাহক পর্যায়ে গড়ে ১৬.৬৮ শতাংশ বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে সরকার। সংকটের সমাধান না করে বিদ্যুৎ বিভাগ উল্টো ভুতুড়ে বিল নিয়ে 'অপপ্রচার' তথা জনগণের প্রতিবাদের জন্য শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। পরে গণপ্রতিরোধের মুখে সে বিবৃতি সংশোধন করতে বাধ্য হয় বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুতখাতে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে পলাতক ও দণ্ডিত শেখ হাসিনার লুটপাটের আয়োজন ছিল জনগণের অর্থলুটের এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। আজকের দিন পর্যন্ত চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও সরকারকে অর্ধেকের বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া পরিশোধ করতে হচ্ছে। গত এক দশকে শুধু ভাড়া বাবদ ব্যয় হয়েছে ৭০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে সরকারের এখন পর্যন্ত কাঠামোগত কোনো কার্যকর উদ্যোগ নাই। ফলে জনগণের অর্থের অপচয় এখনো চলমান।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান বলেন, বিদ্যুৎ সংকটের জন্য বর্তমান সরকারের নূন্যতম কোনো দায় নেই। কিন্তু কেবল পনেরো বছরের দুঃশাসন ও বিধ্বস্ত অবস্থার ওপর দায় চাপিয়ে কি নিজেদের অক্ষমতা, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা ঢাকা যাবে? অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও একই রকম বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। কিন্তু সে সময় আমরা এমন রেকর্ড পরিমাণ লোডশেডিং দেখি নাই। ফলে সরকারের এই বক্তব্য স্রেফ দায়সারা। বিএনপি সরকারের এই রেকর্ড লোডশেডিং জনগণকে তাদের পূর্ববর্তী আমলের কানসাট বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

১.৪ কৃষকের ওপর হয়রানি ও সার সংকট

সরকারের দুর্বল মনিটরিং ও রাজনৈতিক-সমর্থনপুষ্ট সিন্ডিকেটের কারণে চলতি আমন মৌসুমের শুরুতেই দেশের বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের প্রতি বস্তা সারে অতিরিক্ত ৩৫০-৪৫০ টাকা গুনতে হচ্ছে। জ্বালানি পাম্পের মতোই এখন সারের দোকানেও দীর্ঘ সারি, চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম থাকায় কৃষকরা অসাধু ডিলারদের কাছ থেকে চড়া দামে সার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। ক্যাশ মেমো চাইলে সার না দেওয়ার হুমকিও দিচ্ছে রাজনৈতিক মদদপুষ্ট অসাধু ডিলাররা। দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, রাজশাহী, মেহেরপুর, জয়পুরহাটসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সব জেলায় এই চিত্র দেখা যাচ্ছে।

কৃত্রিমভাবে এই সার সংকট তৈরি করা হচ্ছে। যার ফলে একইসাথে উৎপাদন ব্যায়ও বৃদ্ধি পাবে এবং ফলনের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে। পরিণতিতে আমদানি বাজারে বসে থাকা সিন্ডিকেট ও অসাধু আমলাদের দুষ্টচক্র সচল থাকবে। কৃষকেরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে। সরকারের কৃষিকার্ডের মূল্য একজন কৃষককে বস্তাপ্রতি সারে ৪০০-৬০০ টাকা প্রদান করে চুকাতে হচ্ছে।

১.৫ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি

কাগজে কলমে এবং বিএনপির অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া পেইজে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকলেও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চিনি, তেল, মুরগী, ডিম, চাল, ডাল, সবজি সদাইয়ে ক্রেতাদের গত বছরের এই সময়ের তুলনায় কেজিতে অন্ততঃ ১০-১৫ টাকা বেশি গুণতে হচ্ছে। একদিকে কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। অন্যদিকে, ভোক্তাদের উচ্চ মূল্য নিত্যসামগ্রী কিনতে হচ্ছে। কারণ, কৃষক থেকে খুচরা বাজার পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভোগী এবং চাঁদাবাজদের উৎপাত। গণমাধ্যমে উঠে আসা এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে- রাজধানীর কারওয়ানবাজারে ১ দিনেই কোটি টাকার চাঁদাবাজি চলে।

এছাড়াও, পণ্য পরিবহণের প্রতিটি ধাপেই গুণতে হয় চাঁদা। কখনো বাজার ইজারা, কখনো পার্কিং চার্জ, কখনো পরিবহণ মালিক-শ্রমিক সমিতি, কখনো শ্রমিক কল্যাণ - এভাবে নানা প্রক্রিয়ায় উঠে চাঁদা। ফলে ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবসায়ীরা চড়া দামে পণ্যের বিক্রি করছে। যদিও সরকারের সড়কমন্ত্রীর কাছে পরিবহণ খাতের এমন খুল্লামখুল্লা দুর্নীতি চাঁদা না; বরং সমঝোতার ভিত্তিতে অর্থ আদায়।

১.৬ অর্থনৈতিক অপশাসন, ব্যাংক দখল ও বাজার সিন্ডিকেট

আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সিগুলো সরকারের অব্যবস্থাপনা ও সংস্কার-অনিচ্ছার কারণে বাংলাদেশের ক্রেডিট রেটিংকে ইতিমধ্যে নেগেটিভ আউটলুকে নামিয়ে এনেছে। ২০২৫ সালের মার্চ থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জীবনযাত্রার ব্যয় নিম্নমুখী থাকলেও তা এখন আবার ঊর্ধ্বমুখী। এর বিপরীতে সরকারিভাবে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকার দাবি বাস্তব বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ পাহাড়সম আকার নিয়েছে। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের ফোনকলে ব্যাংকের কর্তাব্যক্তিদের রদলবদল হচ্ছে। একদিকে, এস আলমের মতো ব্যাংক লুটেরাদের এবং লুট হওয়া অর্থ ফেরত আনার দৃশ্যমান কার্যক্রম নাই। অন্যদিকে, খেলাপী ঋণকে পুনঃতফশিলীকরণের হিড়িক পড়েছে। Bank Resolution Act, ২০২৬-এর ১৮ক ধারার মাধ্যমে আওয়ামী লীগঘনিষ্ঠ অলিগার্কদের ফের ব্যাংক দখলের সুযোগ তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। কিন্তু বিরোধী দলের প্রতিবাদ ও জনগণের ব্যাপক সমালোচনার মুখে ধারাটি প্রত্যাহার করা হয়। তবুও ইসলামী ব্যাংক দখলের আশঙ্কায় অনেক গ্রাহকরা আমানত তুলে নিতে বাধ্য হন।

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার স্বাধীনতা-পরবর্তী সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে; নতুন ব্যবসা দূরে থাক, পুরোনো ব্যবসাও টিকে থাকতে কষ্ট করছে। শেয়ারবাজারে পুনরায় স্বল্প মূলধনী শেয়ার নিয়ে কারসাজি-জুয়া ফিরে এসেছে। একই সময়ে বসুন্ধরা গ্রুপকে তেল ডিস্ট্রিবিউশন লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। আর্থিক খাত ধ্বংসকারী লুটেরা এস আলম গ্রুপকে ব্যাকডোরে ব্যবসায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করেছে। সম্প্রতি এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন এসএস পাওয়ার-১ লিমিটেডের পক্ষে এলসি খোলার জন্য প্রায় ৩২ লাখ মার্কিন ডলার ছাড়ের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিদ্যুৎ উৎপাদন সচল রাখার যুক্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই বিশেষ অনুমতি প্রদান করেছে। এভাবেই পুরনো লুটেরাদের পুনর্বাসন করছে সরকার।

১.৭ মেগা প্রকল্পে ব্যয়বৃদ্ধি ও লুটপাটের আয়োজন

নির্বাচনের আগে তারেক রহমান ঘোষণা দিয়েছিলেন, বিএনপি মেগা প্রকল্পে যাবে না, কারণ মেগা প্রকল্প মানেই মেগা দুর্নীতি। ক্ষমতা গ্রহণের পর বাস্তবে বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে:

- ঢাকা মেট্রোরেলের সম্প্রসারণ লাইন এমআরটি-৫ (উত্তর)-এর ব্যয় ১২৬ শতাংশ এবং এমআরটি-১-এর ব্যয় ১৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
- রাজবাড়ীর পাংশায় পুরনো ফিজিবিলিটি স্টাডির ভিত্তিতে ২.১ কিলোমিটার পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রথম পর্যায় একনেকে অনুমোদিত হয়েছে, প্রাথমিক ব্যয় ৩৪,৪৯৭ কোটি টাকা। কিন্তু নতুন করে ফিজিবিলিটি স্টাডি, টেকনিক্যাল ডিউ ডিলিজেন্স বা কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিস করা হয় নাই।
- ৪২.৫ মেগাওয়াটের বর্জ্য-থেকে-বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ৪৬৭ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৫,৭৪৫ কোটি টাকা) ধরা হয়েছে। প্রতি মেগাওয়াটে প্রায় ১৩৫.১৭ কোটি টাকা, যা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতি মেগাওয়াট ব্যয়ের (প্রায় ৪৭ কোটি টাকা) চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ ক্রয়মূল্য প্রতি ইউনিট ২৬.৭৯ টাকা, যেখানে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এ ধরনের প্রকল্পের যৌক্তিক খরচ হওয়া উচিত প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টায় ৮-১১ টাকা; অর্থাৎ সৌরবিদ্যুতের আড়াই গুণ ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের প্রায় দ্বিগুণ।

দুই. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

২.১ অত্যাবশ্যক ওষুধের মূল্যনির্ধারণ নীতি বাতিল

১৯৮২ সালে প্রণীত জাতীয় ওষুধনীতি, যার অন্যতম স্থপতি ছিলেন প্রয়াত ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বাংলাদেশে সুলভ ও মানসম্মত ওষুধ সরবরাহ এবং একটি শক্তিশালী দেশীয় ওষুধশিল্প গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি করেছিল। যার ফলে আজ দেশ নিজের ৯৮ শতাংশ ওষুধের চাহিদা নিজেই মেটায় এবং বিশ্বের বহু দেশে রপ্তানি করে।

১৯৯৪ সালে মূল্যনিয়ন্ত্রণের আওতা সংকুচিত করে মাত্র ১১৭টি ওষুধে সীমিত করা হয়, যা পরবর্তী তিন দশকে হালনাগাদ হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই কাঠামো সংস্কার করে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা ২৯৫টিতে সম্প্রসারণ করে এবং একটি নতুন বৈজ্ঞানিক মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতি (অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা ২০২৬ ওওষুধের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ২০২৬) প্রবর্তন করে, যা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ ও সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল।

বিএনপি সরকার আইনী প্রক্রিয়াগত ত্রুটির অজুহাতে পুরো সংস্কারটি বাতিল করে ১৯৯৪ সালের পুরোনো ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেছে। বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ওষুধ বাবদ ব্যয় হওয়ায়, এই সিদ্ধান্ত নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ওপর বাড়তি স্বাস্থ্যব্যয়ের ঝুঁকি তৈরি করবে। বিশেষত দীর্ঘমেয়াদি রোগীদের জন্য এবং জীবনরক্ষাকারী ওষুধের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে। এতে মূলত লাভবান হবে ওষুধ কোম্পানিগুলো। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সাবেক মহাসচিব ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

২.২ হাম মহামারিতে ব্যবস্থাপনাগত ব্যর্থতা

হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে। বহু পরিবার সন্তানের চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। মহামারি ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা জারি না করা, জেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও আইসিইউ সুবিধা নিশ্চিত করতে না পারা, এবং সামগ্রিক অব্যবস্থাপনা মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। অপরদিকে, বিএনপি সরকার কেবল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর দায় চাপিয়ে কাজ সারতে চেয়েছে।

বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে বারংবার জনগণের কাছে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়া হয়েছে। একবার বলা হয়েছে যথেষ্ট টিকা আছে, তারপর পরিস্থিতি খারাপ হলে বলা হয়েছে কোনো টিকাই নেই। স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে টিকা নিয়ে মিথ্যা বলেছেন; বলেছেন এতোদিন নাকি টিকা দেয়া হয় নি। টিকার ক্রয় ও প্রদানের মতো ডকুমেন্টেড বিষয় নিয়ে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর দায় দিয়ে তারা দায়মুক্তি চেয়েছেন।

এছাড়া, এপ্রিলে টিকা প্রদান কর্মসূচিতে সরকার ভুল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো। প্রায় ৪৬ লাখ (বা ২০%) শিশুকে হিসাবে নেয়া হয়নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পাঁচ মাস পর এখনো হাম নিয়ন্ত্রণে না আসার এটি একটি কারণ।

তিন. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক পরিবেশ

৩.১ বিরোধী দলের ওপর দমনপীড়ন

মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের রেকর্ড অনুযায়ী, ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশে ১,৪৯০টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। যার অধিকাংশই বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের দ্বারা সংঘটিত। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা:

- নোয়াখালী-৬ আসনের এমপি ও এনসিপির সিনিয়র মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসুদ নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা-কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গেলে বিএনপি নেতাকর্মীদের দ্বারা হামলার শিকার হন।
- ঝিনাইদহে পুলিশের উপস্থিতিতেই ছাত্রদল-যুবদল নেতাকর্মীরা এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়, আহত হন ১৭ জন। পরে আহতদের বিরুদ্ধেই ছাত্রদল মামলা দায়ের করে এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব তারেক রেজাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়; দুইজনকে কারাগারে ঈদ কাটাতে হয়।
- হবিগঞ্জে 'জুলাই পদযাত্রা' শেষে জেলা সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণেই এনসিপি নেতাকর্মীদের গাড়িতে হামলা হয়, প্রতিবাদ মিছিলেও হামলা চালানো হয়। এতে অন্তত ১০ জন নেতাকর্মী ও কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন। ছাত্রশক্তি নেতা আলিফ চৌধুরী এক চোখের দৃষ্টি হারান। এখানেও হামলায় আহতদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের হয়েছে।
- এর প্রতিবাদে কুড়িগ্রামে এনসিপি-ছাত্রশক্তির বিক্ষোভ মিছিলে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের অতর্কিত হামলায় অন্তত ২০ জন আহত হন।
- একই মাসে সিলেটেও এনসিপির পদযাত্রায় হামলার ঘটনা ঘটে।

ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের এই ধারাবাহিক সহিংসতা রাজনৈতিক সহাবস্থান, বিরোধী দলের রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করছে। উপরোক্ত ঘটনাগুলোতে সরকারকে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। এমনকি দলীয়ভাবেও হামলাকারী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বহিষ্কার, অব্যাহতি বা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। পুরনো ফ্যাসিবাদী চরিত্রকে ধারণ করেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করছে ক্ষমতাসীন দল।

৩.২ মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত শেখ হাসিনার শাসনামলে এনটিএমসি (ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেল)-এর মাধ্যমে নাগরিকদের ওপর আঁড়িপাতা ও ইন্টারনেট বন্ধের মতো কর্মকাণ্ডের জন্য জাতিসংঘ মানবাধিকার দপ্তর (OHCHR) এবং মানবাধিকার কর্মীরা সংস্থাটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এনটিএমসি বিলুপ্ত করে 'সেন্টার ফর ইনফরমেশন সাপোর্ট' নামে নতুন সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু বিএনপি সরকার এনটিএমসির কার্যক্রম বহাল রেখে বরং শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত মে মাসে এনটিএমসির কনটেন্ট ব্লকিং ও ফিল্টারিং সম্প্রসারণে ৯৫ কোটি টাকার সরঞ্জাম ক্রয় প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যাতে রয়েছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফায়ারওয়াল ডিভাইস ও প্যাকেট ব্রোকারসহ নজরদারি অবকাঠামো।

সরকারের এমন প্রবণতার ফল মাঠপর্যায়েও দেখা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারের সমালোচনাকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার-হয়রানির ঘটনাও অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপকে নিয়ে একটি এআই-নির্মিত কার্টুন পোস্ট করার জন্য কনটেন্ট নির্মাতা হাসান নাসিমকে অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধু এপ্রিল মাসেই সাইবার আইনে অন্তত চারটি অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। জুন মাসে ভুয়া স্ক্রিনশটের অভিযোগে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরকেও গ্রেপ্তার করা হয়। গ্যাস সংকট ও লোডশেডিং নিয়ে প্রতিবাদ করায়

হবিগঞ্জে পুলিশ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক মাহাদীসহ তিনজনকে আটক করে, পরে মুচলেকায় জামিন দেওয়া হয়।

৩.৩ সাংবাদিকদের হয়রানি ও হামলা

সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'এখন টিভি'র চার সাংবাদিককে প্রথমে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো এবং পরে চাকরিচ্যুত করা হয়। শাহবাগ থানার ভেতরে দায়িত্ব পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির অন্তত ১০ জন সংবাদকর্মী ছাত্রদল নেতাকর্মীদের হামলার শিকার হন। এই ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত মামলাই গ্রহণ করেনি। হবিগঞ্জে এনসিপির পদযাত্রার সংবাদ সংগ্রহকালে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক হামলার শিকার হন এবং কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর হয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে সাংবাদিক হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে ২৩৭টি। যা স্বাধীন গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের জন্য গুরুতর হুমকি।

৩.৪ রাজনৈতিক সহিংসতা ও গণপিটুনি

সরকার গঠনের এক মাস পরই তথ্য ভবনে জুলাই অভ্যুত্থান বিষয়ক তথ্যচিত্রের বকেয়া বিল আনতে যাওয়া চলচ্চিত্রকর্মী ও শিল্পীরা হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ ছাত্রদলের একাংশের হামলার শিকার হন; হামলাকারীরা সরকারি অফিসের সিসিটিভি ফুটেজও সরিয়ে নেয়। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) তথ্যমতে, গণপিটুনিতে নিহতের সংখ্যা ছয় মাসে দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৩ জনে।

৩.৫ গণভোটের জনরায় উপেক্ষা করে সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ গ্রহণ না করা

নির্বাচনের আগে বিএনপি দলগতভাবে গণভোটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি; তারেক রহমান নিজে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়ের পর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গণভোটের রায় অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নেয়নি সরকার, বরং পরিষদকে 'অবৈধ' ও 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়েছে। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, নির্বাচনের স্বার্থে তাঁরা তখন অনেক কথা বলেননি এবং নির্বাচন যাতে বিলম্বিত না হয় সেজন্য আপস করে জুলাই জাতীয় সনদে সই করেছিলেন। যা কার্যত জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণের সংসদে দাঁড়িয়ে জনগণের সঙ্গে প্রতারণার স্বীকৃতি।

বিএনপির ৩১ দফার একটি দফা ছিল সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন, অথচ নির্বাচিত হওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বলেন, "সংবিধান সংস্কার হয় না, সংবিধান সংশোধন হয়।" সংবিধান সংস্কার পরিষদের পরিবর্তে সরকার নিজস্ব দলীয় উদ্যোগে 'সংবিধান সংশোধন কমিটি' গঠন করেছে। এটি স্রেফ ছলচাতুরি এবং চোখে ধুলা দেওয়া। কারণ, সংসদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই সংবিধান সংশোধন সম্ভব এবং পৃথক কমিটির প্রয়োজন নাই।

এভাবেই এই সরকার নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহার, ৩১ দফা এবং সংস্কার প্রস্তাবনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে উল্টা রথযাত্রা শুরু করেছে।

চার. প্রাতিষ্ঠানিক দলীয়করণ ও নিয়োগ-বাণিজ্য

৪.১ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ

ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম মাসেই ঋণখেলাপের অভিযোগ থাকা একজন দলীয় ব্যবসায়ীকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি বিএনপির ৪১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ২৩তম সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দলীয় ব্যবসায়ীকে গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়।

সরকারে এসেই ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৯ জনই দলটির রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। তবে মূল উদ্বেগের বিষয় হলো- আটটিতেই সার্চ কমিটির সুপারিশ ছাড়াই এবং তিনটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের প্যানেল গঠনের বিধান এড়িয়ে 'বিশেষ পরিস্থিতির' অজুহাতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অথচ এখন কোনো বিশেষ পরিস্থিতি নেই।

জুন-জুলাইয়ে ১১টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা-বোর্ড-করপোরেশন এবং ৮টি নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের শীর্ষ পদে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বর্তমান-সাবেক ১৭ নেতাকে নির্লজ্জভাবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়। অধিকন্তু, নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী তাঁদের দলীয় পদ ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে করা হয়নি। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠছে বিএনপির দলীয় ক্লাব।

দেশের ১১টি সিটি করপোরেশন ও ৬৩টি জেলা পরিষদে বিএনপির নেতাদের প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাদের অনেকে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন বা দলীয় মনোনয়ন পাননি। এটি বিএনপির নিজস্ব ৩১ দফার প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যেখানে বলা হয়েছিল মৃত্যু বা আদালতের আদেশ ছাড়া স্থানীয় সরকারে প্রশাসক নিয়োগ করা হবে না। বিএনপি সরকার বিশেষ পরিস্থিতির অজুহাতে নির্বাচন ব্যতীত দলীয় কর্মীদের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দিচ্ছে। এরচেয়েও ভয়ানক ব্যাপার হলো- সম্প্রতি সংসদে পাশ হওয়া নতুন স্থানীয় সরকার আইনেও নির্বাহী আদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধি অপসারণ করে প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা বহাল রাখা হয়েছে। এমনকি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও দলীয় সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এর ফলে এই কমিশনের কার্যক্রমও ভবিষ্যতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

ফলে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠছে বিএনপির পরাজিত ও পদবঞ্চিত প্রার্থীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র।

৪.২ রাজনৈতিক স্বজনপ্রীতি

পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বিএনপির স্থায়ী কমিটির নেতা ও এমপি-মন্ত্রীদের সন্তানরা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারি কাজে নিয়োগ পাচ্ছেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এডহক কমিটিতে স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদের পুত্র সৈয়দ ইব্রাহীম আহমেদ (যিনি বিসিবির টেন্ডার ও পারচেজ কমিটিতেও আছেন), মির্জা আব্বাসের পুত্র ইয়াসির আব্বাস এবং আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর পুত্র ইসরাফিল খসরুকে নিয়োগ দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের পুত্র মীর সীমান্তের কোম্পানিকে বগুড়ার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের ঠিকাদারিত্ব দেওয়া হয়েছে; তাঁর নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়নের নামকরণেও পারিবারিক নাম ব্যবহারের ঘটনা ঘটেছে। জনগণের ব্যাপক সমালোচনার মুখে পরে এসব নির্লজ্জ বালখিল্যতা সংশোধন করা হয়।

চলতি মাসে জাপানি কোম্পানি গরুধমধধি কবহংবঃং ভোলা-বরিশালসহ তিনটি সেতুতে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের স্থানীয় অংশীদার হিসেবে উপস্থিত ছিল স্ট্যালিয়ন ক্যাপিটাল, যার চেয়ারম্যান সৈয়দ ইব্রাহীম আহমেদ। উভয় কোম্পানিরই এত বড় প্রকল্প পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, স্ট্যালিয়ন ক্যাপিটাল কোম্পানির ৪০ হাজার টাকার বিনিয়োগ নিয়েও কাজ করার কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। জাপানি কোম্পানিটির অভিজ্ঞতা নেই ৪০ কোটি টাকার কোনো প্রজেক্ট করারও।

জনগণের টাকায় পরিচালিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রকল্পে এমপি-মন্ত্রীদের পুত্রদের যুক্ত করার মাধ্যমে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও পারিবারিক রাজনৈতিক বিকাশের নতুন সংস্কৃতি তৈরি করছে বিএনপি।

৪.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও ন্যায়পাল

বিএনপির ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমন আইনের সংস্কার, কমিশনের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা এবং ন্যায়পাল নিয়োগের প্রতিশ্রুতি ছিল। বাস্তবে, দ্রুতগতিতে জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশনে দলীয় প্রশাসক নিয়োগ করা হলেও দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান পদ ১৬৬ দিন শূন্য ছিল; ন্যায়পাল নিয়োগে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি এবং একই পরিস্থিতি মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।

অতি সম্প্রতি দুদকের চেয়ারম্যান পদে একজন অবসারপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধান ৯৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোনো বিচারপতিকে বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ ছাড়া প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ দেওয়া যায় না। দুদক চেয়ারম্যানের পদ স্পষ্টতই একটি লাভজনক পদ। দুদক কোনো বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান নয়।

বিএনপি তার ইতিপূর্বের শাসনামলেও একইভাবে একজন সাবেক বিচারপতিকে দদকের দায়িত্ব দিয়েছিল। তখনও এটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। ফলে, সরকারের কর্মকাণ্ডের চেক ও ব্যালেন্স করতে পারে এমন সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার নানা ছলচাতুরীতে অকার্যকর করে রেখেছে।

৪.৪ মানবাধিকার কমিশন আইন দুর্বলীকরণ

সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রণীত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ ল্যাপস করে দিয়েছে। বিরোধী জোটের আপত্তির মুখে আরও শক্তিশালী আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত খসড়া বিলের কিছু ধারা বরং ২০০৯ সালের আইনের চেয়েও দুর্বল:

- বিদ্যমান বিলে শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হয়নি; কমিশন কেবল সরকারের কাছে প্রতিবেদন চাইতে ও সুপারিশ করতে পারবে। ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে কমিশনকে বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।
- অধ্যাদেশে ছিল, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনও কোনো অজুহাতে রেহাই পাবে না। কিন্তু নতুন খসড়ায় এই বিধান নেই।
- অধ্যাদেশে কমিশনকে কারাগার, আটককেন্দ্র বা নিরাপত্তা হেফাজত পরিদর্শনের স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল; নতুন খসড়ায় এ ধরনের পরিদর্শনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে। ফলে শেখ হাসিনার আমলে পরিচালিত গোপন বন্দিশালা ('আয়নাঘর')-এর মতো স্থাপনা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বাস্তবে এই আইন অকার্যকর হবে। কারণ কর্তৃপক্ষ অতীতেও এমন বন্দিশালার অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই এবং ভবিষ্যতেও করবে না।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অধ্যাদেশে বাছাই কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক, সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মানবাধিকার গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও ভিন্ন জাতিসত্ত্বার প্রতিনিধি। নতুন খসড়ায় স্পিকারের সভাপতিত্বে গঠিত ৯ সদস্যের কমিটির পাঁচজনই সরাসরি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলে সরকারের পছন্দের বাইরে কারও নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

উপরন্তু, সরকারের ছয় মাস পার হলেও বর্তমানে কার্যকর কোনো মানবাধিকার কমিশনই নাই। ফলে এই সরকারের আমলে সংঘটিত বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তদন্ত আমরা দেখতে পাই নাই।

৪.৫ গুম প্রতিরোধ অধ্যাদেশ বাতিল করে দুর্বল আইন প্রণয়ন

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রণীত গুম প্রতিকার ও প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০২৬-ও ল্যাপস করা হয়েছে। তার পরিবর্তে বর্তমান প্রস্তাবিত খসড়া অনুযায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা গুমের অভিযোগ পুলিশ নিজেই তদন্ত করবে; তদন্তে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে অভিযোগকারী পরিবার সশ্রম কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারে। এই কাঠামো প্রকৃত ভুক্তভোগীদের অভিযোগ জানাতেও নিরুৎসাহিত করবে। বাংলাদেশ ২০২৪ সালের আগস্টে গুম থেকে সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে। যার ১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হতে হবে। অভিযুক্ত বাহিনী নিজেই নিজের তদন্তে অংশ নিতে পারবে না মর্মে জাতিসংঘের গুমবিষয়ক কমিটিও স্পষ্টভাবে বলেছে। খসড়া বিলের ১৪ ধারা এই ন্যূনতম মানও পূরণ করতে পারে নাই।

উল্লেখ্য, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইলিয়াস আলীসহ বিএনপির শীর্ষ নেতারা গুম হওয়ার ঘটনায় বিএনপি ও ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ সংস্থার তদন্ত, বিচারবিভাগীয় তদন্ত, এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থার তদন্তের দাবি জানানো হয়েছিলো। কিন্তু, এখন বিএনপি সরকারের শাসনামলে তারা গুমের ক্ষেত্রে পুলিশের তদন্তেই আস্থা রাখতে চান।

এই সমালোচনার বাস্তব দৃষ্টান্ত- ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র দুই মাসের মাথায় ১০ এপ্রিল বাগেরহাটের মোংলায় মিরাজ শেখ নামে একজন নাগরিককে কোস্টগার্ড তুলে নিয়ে যায়। পরিবারের রিট আবেদনে হাইকোর্ট ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তাঁকে হাজির করতে নির্দেশ দিলেও এখনো তাঁর সন্ধান মেলেনি। বরং পরিবারের সদস্যরা হামলা-মামলা-জেলের শিকার হচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

একদিকে সরকার গুমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বয়ান ও হম্বিতম্বি করছে। অন্যদিকে, গুম করার সম্ভাবনাকে আইন করে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। ফলে এটা স্রেফ অদক্ষতা নয়; বরং অসৎ উদ্দেশ্যের পরিচয়।

৪.৬ নতুন মোড়কে র‍্যাব: স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)

গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গোপন বন্দিশালা পরিচালনার অভিযোগে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মহল থেকে র‍্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ এসেছিল। এমনকি নির্বাচনের আগে বিএনপি নিজেও সংবাদ সম্মেলন করে র‍্যাব বিলুপ্তির দাবি করেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে ১৮০ ডিগ্রি উল্টে গিয়ে বাহিনীটি বিলুপ্ত না করে 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন' (এসআরবি) নামে র‍্যাব পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত খসড়া অনুযায়ী র‍্যাবের জনবল, ক্ষমতা, তহবিল, সম্পত্তি ও নথি প্রায় অবিকৃতভাবে এসআরবিতে হস্তান্তরিত হবে।

গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সুপারিশ ছিল- নতুন বিশেষায়িত বাহিনী গঠিত হলে তা শুধু প্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্যদের নিয়ে করতে হবে; সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কারণ প্রেষণে যাওয়া সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা মূল বাহিনীর কমান্ড কাঠামোর বাইরে চলে যান এবং অপরাধে জড়ালে মূল বাহিনীর পেশাদারিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়। অনুমোদিত খসড়ায় এই সুপারিশ প্রতিফলিত হয়নি। সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের এসআরবিতে সংযুক্ত করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

খসড়ার ১২ ধারা অনুযায়ী এসআরবি পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তার করতে পারবে; এর নিজস্ব হাজতখানা, মালখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকবে; এবং আদালত, সরকার বা আইজিপি যে কেউ এসআরবিকে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন। এসব বিধান পুরনো র‍্যাব কাঠামোর তুলনায় ক্ষমতাকে আরও সম্প্রসারিত করে। খসড়ায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে 'অনতিবিলম্বে' থানা হেফাজতে দেওয়ার বিধান (ধারা ১৪) এবং এসআরবির নিজস্ব হাজতখানা রাখার বিধান (ধারা ১৫(৪)) পরস্পরবিরোধী, এবং কাকে কতক্ষণ এসআরবি হেফাজতে রাখা যাবে তা স্পষ্ট করা হয় নাই।

ফলে এসআরবি নামে র‍্যাবের পুনর্গঠন এবং নতুন আইন প্রণয়ন স্যাংশন থেকে বাঁচার কৌশল ব্যতীত ভিন্ন কিছু না।

৪.৭ সুপ্রিমকোর্ট সচিবালয় বিলুপ্তি

বিএনপির ৩১ দফায় স্পষ্টভাবে বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রিমকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন পৃথক সচিবালয় গঠনের প্রতিশ্রুতি ছিল। জুলাই জাতীয় সনদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফায় নোট অব ডিসেন্ট দিলেও এই দফায় বিএনপি কোনো আপত্তি জানায়নি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই লক্ষ্যে অধ্যাদেশ জারি করে সচিবালয় গঠনও করেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে বিএনপি সরকার সেই অধ্যাদেশ বাতিল করে সচিবালয়টি বিলুপ্ত করে দিয়েছে। নিজেদেরই প্রতিশ্রুত সংস্কার বাস্তবায়িত হওয়ার পর তা বাতিল করা কেবল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং প্রতারণা নয়; বরং বিচার বিভাগের প্রতি সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য থাকার প্রমাণ। সরকার অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে এবং উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগেও থাবা বসানোর চেষ্টা করছে। অবশ্য বিএনপি সরকারের এমন রোগ বেশ পুরোনো।

পাঁচ. আইনশৃঙ্খলা, দখল ও চাঁদাবাজি

৫.১ আইনশৃঙ্খলা পরিসংখ্যান

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সরকার দায়িত্ব নেওয়ার মার্চ থেকে জুলাই এই পাঁচ মাসে থানায় মামলা হয়েছে ৮৮,২১৭ টি, যার মধ্যে হত্যা ১,৫৩৯টি, নারী-শিশু নির্যাতন ৯,৯৮৪ টি, ডাকাতি/ছিনতাই ২,৩৯৭ টি, চুরি ৪১৭৪ টি, মাদক মামলা ৩০,৮২৩ টি, চোরাচালান ১,০৫৬টি। এসময়ে সারাদেশে মাসে গড়ে ৩০৮ টি হত্যাকান্ড হচ্ছে, যা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের তুলনায় প্রায় ১০% বেশি। অন্তর্বর্তী সরকারের তুলনায় চুরি, ডাকাতি/ছিনতাই, নারী-শিশু নির্যাতনের মামলা, মাদকের মামলা, চোরাচালানের মামলা সবকিছুই বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে মোট ৮৩০ টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৫৬ জন নিহত ও ৫২৪৬ জনের অধিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন। আর ৮৩০ টি ঘটনার মধ্যে ৭৭০টিতেই বিএনপির সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মাত্র ছয় মাসে বিএনপির নিজস্ব দলীয় কোন্দল, চাঁদাবাজির হিস্যা, দখলদারিত্ব ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে অন্তত ২৭৩টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যাতে অন্তত ৩১ জন নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন। একই সময়ে ৪০০ জন নারী-কিশোরী-শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১০১ জন সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার এবং ৪০ জনকে হত্যা করা হয়েছে; উত্তেজিত জনতার পিটুনিতে নিহত হয়েছেন ১৩৪ জন। (এইচআরএসএস ও আসকের প্রতিবেদন)

একদিকে সরকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। অপরদিকে, অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেওয়া ছাত্রদল নেতাকেও মুচলেকায় ছেড়ে দিয়ে নিজ দলের সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করছে।

৫.২ দখল ও চাঁদাবাজি

নির্বাচনের আগে চট্টগ্রাম-১৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী নেতাকর্মীদের বলেছিলেন, “১২ তারিখ পর্যন্ত চাঁদাবাজি করবেন না”।

ক্ষমতায় আসার পরদিন থেকেই ব্যবসায়ীরা বিশেষতঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা, বিএনপি নেতাকর্মীদের দ্বারা ব্যাপক চাঁদাবাজির শিকার হচ্ছেন। যার বিরুদ্ধে লোকদেখানো দলীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলেও আইনি ব্যবস্থা প্রায় নেওয়া হয়নি। চলতি মাসে কক্সবাজারে সরকারি খাসজমি দখলচেষ্টা করে বিএনপির কিছু স্থানীয় নেতাকর্মী। পরে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গাজীপুরের টঙ্গিতে চাঁদা চাওয়ার সময় ওয়ার্ড ছাত্রদল সভাপতিকে ফোনালাপে বলতে শোনা যায় -ওএখানে তারেক রহমান আইলেও কাম হইব না২ পত্রপত্রিকার প্রতিবেদনে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের ১২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তত ৬টিতে ঝুট/শিল্পবর্জ্য নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

নিউমার্কেট এলাকায় ফুটপাত দখল ও চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে যুবদল ও ছাত্রদলের সংঘর্ষও হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ। চাঁদা না দিলে হামলা বা গুলির শিকার হওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

ওয়ার্ডের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে এমপিপুত্র, আজিমপুর গোরস্থান থেকে শুরু করে মহিষ চারণভূমি পর্যন্ত এতো বেশি চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে যে, এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে এগুলো উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না।

৫.৩ মাঠ পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের হেনস্তা

ফ্যামিলি কার্ড শুমারি তালিকা ও সুপারভাইজার পদ নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, রাজশাহীর বাগমারা, গাইবান্ধার ফুলছড়িসহ মোট ১৮টি ইউএনও কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর বা হুমকির ঘটনা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে।

নাটোরের লালপুর ও বাগাতিপাড়া ইউএনও কার্যালয়ে সুপারভাইজার নিয়োগের ফলাফল নিয়ে অসন্তোষে হামলা-ভাঙচুর-লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে। হামলার সাথে সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরদিনই নাটোরের জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহার ও লালপুরের ইউএনওকে বদলি করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আদালতে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির সমালোচনা করার জেরে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা বিচারকের খাসকামরা ও এজলাস কক্ষ ভাঙচুর করেছে।

ছয়. শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য

৬.১ শিক্ষাঙ্গনে সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাস

ক্ষমতায় আরোহণের পরপরই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল পুরনো কায়দায় দখল ও সন্ত্রাস ফেরত এনেছে। এতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রবলভাবে দৃশ্যমান।

শাহবাগ থানার অভ্যন্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি ও ডাকসু নেতৃবৃন্দের ওপর ছাত্রদলের হামলার পরও কোনো আইনি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশক্তি ও জকসু নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা, এমনকি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায়ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা কলেজ, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ও বুটেক্সসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গত ছয় মাসে শিক্ষার্থী ও বিরোধী মতের ওপর দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে ছাত্রদল। প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনেই এসব হামলা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি; বরং একটি ঘটনায় লাঠি হাতে একজন পরিচিত যুবদল নেতাকে প্রকাশ্যে পুলিশকে নির্দেশ দিতে দেখা গেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমান সরকার-নিযুক্ত প্রশাসন বাকি ক্যাম্পাসগুলোতে নির্বাচন আটকে রেখেছে।

৬.২ এইচএসসি পরীক্ষায় অব্যবস্থাপনা ও শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

এবারের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর ব্যাপক অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে। কুমিল্লা, নোয়াখালী, বগুড়াসহ বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার্থীদের কোমর বা হাঁটুসমান পানি পাড়ি দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হয়েছে। অথচ এই ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আগাম প্রস্তুতি ছিল না।

এছাড়া, ৫ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে এনটিআরসিএ-র পরিবর্তে ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডিকে ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাব ফেরত আনার চেষ্টা করে সরকার। কিন্তু ব্যাপক সমালোচনার মুখে শিক্ষামন্ত্রী পরে জানান, এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

সাত. শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থান

নতুন কর্মসংস্থান তৈরি না হওয়ার পাশাপাশি বিদেশগামী জনশক্তি রপ্তানিও ধারাবাহিকভাবে কমছে:

অর্থবছর	বিদেশগামী কর্মী	পরিবর্তন
২০২৩-২৪	১১.৯৭ লাখ	–
২০২৪-২৫	১০.১৬ লাখ	১৫.১৬% হ্রাস
২০২৫-২৬	৯.৬৯ লাখ	৪.৫৮% হ্রাস

২০২১-২২ অর্থবছরে রেকর্ড ৯.৮৯ লাখ থেকে বেড়ে ২০২৩-২০২৪-এ প্রায় ১২ লাখে পৌঁছানোর পর এই নিম্নমুখী প্রবণতা বৈদেশিক কর্মসংস্থান, রেমিট্যান্স প্রবাহ ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য উদ্বেগজনক। বিএনপি সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতি বছর ২০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অর্থাৎ, মাসে গড়ে দেড় লাখেরও বেশি।

অথচ BMET এর তথ্যমতে, এ বছরের মার্চ থেকে জুলাই এই পাঁচ মাসে বিদেশে কর্মী গিয়েছেন গড়ে ৫৫ হাজার। গত বছর একই সময়ে এই সংখ্যাটা ছিলো ৮৫ হাজার এবং তার আগের বছর ৮৩ হাজার। চলতি আগস্ট মাসে বিদেশে নতুন কর্মীর সংখ্যা গত বছরের অর্ধেকেরও কম হবার পথে আছে।

আট. জুলাই : বিচার, চিকিৎসা, পুনর্বাসন

৮.১ জুলাই গণহত্যার বিচারে অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়

সরকারের অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় জুলাই গণহত্যার বিচার ছিল না। ফলে বিচার কাজের দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতিও দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও, গ্যাজেটভুক্ত জুলাই শহীদদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের পৃথক পৃথক ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে। সে সকল মামলার তদন্তের অগ্রগতির কোনো খবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

৮.২ অভ্যুত্থানের ইতিহাস দলীয়করণ

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও ছাত্রনেতৃত্বের গণঅভ্যুত্থানকে দলীয় ইতিহাসে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছে বিএনপি সরকার। ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবসের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত প্রামাণ্যচিত্রে এক দফা থেকে জুলাই অভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের প্রকৃত নায়কদের আড়াল করে তা বিএনপির দলীয় আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এনসিপি ও আহতযোদ্ধাদের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী ভুল স্বীকার করেন।

এছাড়াও, জুলাই জাদুঘর থেকে ফেলানি ও সীমান্ত হত্যাবিরোধী লড়াই, আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলনসহ ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের একাধিক নিদর্শন সরকারি হস্তক্ষেপে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এভাবে সরকার অভ্যুত্থানকে জনগণ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের দলীয় ইতিহাসে পরিণত করার পাঁয়তারা করেছে।

৮.৩ আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে গাফেলতি

অভ্যুত্থানের দুই বছর অতিবাহিত হলেও জুলাইয়ের আহতযোদ্ধাদের দুর্ভোগ এখনও শেষ হয় নাই। সম্প্রতি জুলাইয়ে পায়ে গুলি খেয়ে আহত একজন শিক্ষার্থীর পা কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা। এভাবে অনেক জুলাই আহত এখনো চিকিৎসাসেবা নিয়ে যাচ্ছেন। অনেকের পুনর্বাসন নেই। ঔষুদের খরচ নেই। কিন্তু এসব নিয়ে সরকারের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ও দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায় নাই।

নয়. দ্বিধান্বিত পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সরকার দ্বিধান্বিত অবস্থায় আছে। কখনো প্রবল আত্মবিশ্বাসী, আবার কখনো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সীমান্ত হত্যা বন্ধ্যা সরকার দুয়েকটা কড়া বিবৃতি ব্যতীত কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। একদিকে সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে সরকারের কড়া বিবৃতি, অন্যদিকে জুলাই জাদুঘর থেকে সীমান্ত হত্যার অন্যতম প্রতিরোধী নিদর্শন ফেলানীর চিত্র সরিয়ে ফেলা - কোনো আত্মবিশ্বাসী পররাষ্ট্রনীতির পরিচায়ক না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে দুবাইয়ে সাবেক আইজিপি বেনজিরের গ্রেফতারের খবর পড়ে উচ্ছ্বসিত হন। কিন্তু তার দুই মাস পরেও এই আসামীকে ফেরত আনার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দেখা যায় নি।